হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

মডেল টেস্ট- ০১

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	M	৪	N	৫	K	৬	L	৭	M	৮	N	৯	M	১০	N	১১	K	১২	L	১৩	M	১৪	K	১৫	M
	১৬	L	১৭	L	১৮	K	১৯	K	২০	L	২১	M	২২	L	২৩	N	২৪	K	২৫	N	২৬	N	২৭	M	২৮	L	২৯	L	৩০	K

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তাঁকে জীবাত্মা বলা হয়।

খ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার বলে তাঁকে ভগবান বলা হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই শ্রীমদভাগবতে বলা হয়েছে, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। ঈশ্বরের দশ অবতারের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ভুক্ত নন।

গ উদ্দীপকের প্রদীপ বাবু ঈশ্বরের সাকাররূপের উপাসনা করেন।
দেব-দেবীরা হলেন ঈশ্বরের সাকার রূপ। ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা। তিনি নিরাকার, আবার প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করেন। ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে কোনো বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন তখন তাদেরকে দেব-দেবী বলা হয়। যেমন– ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি। সাকার বা প্রতীক উপাসনা বিভিন্ন দেব-দেবীকে খুশি করার জন্য করা হয়। এ সময় দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে তার সামনে পূজা করা হয়।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, প্রদীপ বাবু তার বাড়িতে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করেন। দেব-দেবীর পূজা করাকে বলা হয় সাকার উপাসনা। বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমাকে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা প্রভৃতি) উদ্দেশ্য করেই মূলত এ ধরনের উপাসনা করা হয়। সগুণরূপে ঈশ্বর সাকাররূপে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতিকৃতিতে প্রকাশিত হন। পূজা করাকে সগুণ উপাসনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই বলা যায়, প্রদীপ বাবু ঈশ্বরের সাকাররূপের উপাসনা করেন।

ঘ হ্যাঁ, সুভাষ বাবুর অনুসরণকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরাকাররূপের উপাসনা করে মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব।
'নিরাকার' শব্দের অর্থ যার কোনো আকার নেই। মূলত এ ধরনের উপাসনা ধ্যান সাধনার মাধ্যমে করা হয়। এ উপাসনা ঈশ্বরের কোনো প্রতিকৃতিকে উদ্দেশ্য করে করা হয় না। জ্ঞানযোগ নিরাকার উপাসনার একটি অংশ। নিরাকাররূপ ঈশ্বর অদৃশ্য অবস্থায় থাকেন। তাঁকে উপলব্ধি করে উপাসনা করা হয়। উদ্দীপকের সুভাষ বাবু কোনো পূজা অর্চনা করেন না। এমনকি তিনি মন্দিরে দেব-দেবীর দর্শনেও যান না। তিনি প্রত্যহ উষাকালে ও সন্ধ্যায় নীরবে বসে একমনে নিষ্কামভাবে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেন। অর্থাৎ তিনি নিরাকার উপাসনা করেন। উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং মোক্ষলাভ। হিন্দুধর্মালম্বীরা কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার উল্লেখ করেছেন, 'যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাদের আমি সেভাবেই কৃপা করে থাকি।' এ থেকে বোঝা যায়, সাকার এবং নিরাকার উভয় প্রকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং কৃপা লাভ করা সম্ভব। আর ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করাই হলো পরম তৃপ্তি এবং মোক্ষলাভের একমাত্র পথ।
উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শুধু ঈশ্বরের সাকার উপাসনা নয়, বরং নিরাকার উপাসনার মাধ্যমেও মোক্ষলাভ করা সম্ভব। উপাসনার একমাত্র উদ্দেশ্যই হলো মোক্ষলাভ। সেটা সাকার বা নিরাকার যাই হোক না কেন।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিনা প্রয়োজনে দ্রব্য গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলা হয়।

খ হিন্দুধর্মকে একাধারে প্রাচীন এবং নবীন বলার কারণ হলো এটি সনাতন ঐতিহ্য বজায় রেখে যুগের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলছে।
হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম। বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে এ ধর্ম একাধারে প্রাচীন এবং নবীন। প্রাচীন বলার কারণ হলো সনাতন ধর্ম তার প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখেছে আর নবীন বলার কারণ হলো এ ধর্ম তার প্রাচীন ঐতিহ্য বজায় রেখেও যুগের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলছে।

গ উদ্দীপকের আবিরের মধ্যে সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ ফুটে উঠেছে। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন একজন সমাজ-সংস্কারক। তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন নিয়মের সংস্কার এবং সমাজ থেকে ধর্মের নামে প্রচলিত অনেক কুপ্রথা দূর করেন। তিনি লক্ষ করেন, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক হয়ে এক হিন্দুসম্প্রদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচিন্তায় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। সব দেব-দেবীই যে এক ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকাশ তারা তা ভুলতে বসেছে। তখন তিনি এক ঈশ্বরের উপাসনা তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি হিন্দুধর্মাবলম্বীদের এক ঈশ্বরের আরাধনা করার আহ্বান জানান। তিনি বললেন ব্রহ্মই একমাত্র আরাধ্য এবং হিন্দুরা একেশ্বরবাদী।

উদ্দীপকে দেখা যায়, আবির কোনো দেব-দেবীর পূজা করে না। তবে ঈশ্বরের প্রতি রয়েছে তার অগাধ ভক্তি। তিনি চিন্তা করেন দেব-দেবীরা যেহেতু ঈশ্বরেরই এক একটি শক্তির প্রকাশ তাই দেব-দেবীর পূজা না করে শুধু ঈশ্বরের পূজা করাই উত্তম। এখানে সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। রাজা রামমোহন রায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিভিন্ন দেব-দেবী এক ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। তাই আলাদা আলাদা পূজা করে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ তৈরির কোনো প্রয়োজন নেই। তাই তিনি মনে করেন বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার পরিবর্তে এক ঈশ্বরের পূজা করাই উত্তম।

ঘ 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ধারণার আলোকে আবির ও সলিল উভয়ের ধারণাই সঠিক।

বেদ ও উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। প্রচলিত বহু দেব-দেবীর উপাসনা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক। তবে দেব-দেবীগণ ঈশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা গুণের অধিকারী। দেব-দেবীর আরাধনা করে মানুষ যে সাফল্য অর্জন করে তাতে এক ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটে। সাকার দেবী কালী যিনি, নিরাকার এক ব্রহ্মও তিনি। তাই বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করা হলেও মূলত এক পরমেশ্বরেরই উপাসনা করা হচ্ছে। একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের একটি বিশ্বাস এবং এজন্য হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একেশ্বরবাদী বলা হয়।

পূজা-অর্চনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং মোক্ষলাভ। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা কেউ নিরাকার, কেউবা সাকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে পূজা করেন। তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার মাধ্যমে এক ঈশ্বরকেই পাওয়ার চেষ্টা করেন। যে যেভাবেই ঈশ্বরের উপাসনা করুক না কেন, ঈশ্বর তাতেই সাড়া দেন। এ সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উল্লেখ করেছেন, 'যারা যেভাবে আমাকে ভজনা করে তাদের আমি সেভাবেই কৃপা করে থাকি।' এ থেকে বোঝা যায়, সাকার এবং নিরাকার উভয় প্রকার উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং কৃপা লাভ করা সম্ভব।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ঈশ্বরের উপাসনার ক্ষেত্রে আবির ও সলিল দুজনের ধারণাই সঠিক। একেশ্বর বা বহু দেব-দেবীর আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে তাকে ধর্মাচার বলে।

খ শ্যামা বা কালীপূজার দিন রাত্রে মনের কালিমা দূর করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় 'দীপাবলি' উৎসব। প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করা হয়। সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মোহান্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে পালিত হয় এই দীপাবলি উৎসব। সকল কুসংস্কার প্রদীপের আগুনে পুড়িয়ে জ্ঞানের আলোকে সারা বিশ্ব আলোকিত হোক, এ ব্রত নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালন করা হয়। এটি দেওয়ালি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

গ উদ্দীপকে সোমা যে অনুষ্ঠানটি পালন করছে তা হলো দোলযাত্রা। পাঠ্যপুস্তকের আলোকে নিচে তা আলোচনা করা হলো :

দোল পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবীর, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাদের পূজা দিয়ে পরস্পরকে রং বা আবীর মাখিয়ে সকলে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক স্থানে এসময় সমস্বরে বলা হয়, "আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল।"

এটি মূলত বৈষ্ণবীয় উৎসব। এ ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্যান্য গোপীগণের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন। একে বসন্ত উৎসবও বলা যায়। উদ্দীপকে কণিকাদের গ্রামের ধর্মানুষ্ঠানটিও প্রতিবছর বসন্তকালে আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটিও বৈষ্ণবদের জন্য করা যায়। এছাড়া এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একজন আরেকজনকে রাঙিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকে রীপাদের বাড়ির সামনে মন্দিরের মাঠে যে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা হলো নামযজ্ঞ। নিচে নামযজ্ঞের সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলো :

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করা হয়। বিভিন্ন সুরে, ছন্দে, তালে কৃষ্ণনাম এবং রামনাম কীর্তন করা হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠানটি স্থান, সময় এবং আয়োজনের পরিধিভেদে কয়েক প্রহরব্যাপী হয়ে থাকে। তিন ঘণ্টায় এক প্রহর ধরা হয়। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মন্দির বা নামযজ্ঞানুষ্ঠান স্থানটি পবিত্র রাখা হয়। এই নামযজ্ঞ সামাজিক জীবনে অনেক গুরুত্ব বহন করে। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে শ্রীহরির নাম নিলে বা শুনলে সে পুণ্য লাভ হয়। দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আর এ বিশ্বাস নিয়েই মানুষ বহুদূর থেকে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়। নামযজ্ঞের মতো ধর্মাচার বা ধর্মনীতি মানুষকে ভদ্র, নম্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এভাবেই ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সবাই একাত্ম হয়ে সামাজিক বন্ধন আরও সুদৃঢ় করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকে রীপার বাড়িতে অনুষ্ঠিত নামযজ্ঞ মানুষকে একত্র করে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করায় এর সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয় তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ।

খ দেহ থেকে আত্মা অন্তর্হিত হলে দেহ আস্তে আস্তে পচে যায়, তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের সৎকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নামে পরিচিত। অন্ত্যেষ্টি শব্দের অর্থ 'শেষযজ্ঞ' অর্থাৎ অগ্নিতে মৃতদেহকে আহুতি দেওয়া। মৃত্যু মানে দেহ থেকে আত্মার বহির্গমন। আত্মা দেহ থেকে বের হলে দেহটি একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে পচতে শুরু করে। ভূপৃষ্ঠে পড়ে থাকলে তখন ভীতির সঞ্চার হয় এবং পরিবেশ নষ্ট হয়। তাই শাস্ত্রে মৃতদেহের সৎকারের বিধান দেওয়া হয়েছে। শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বা সৎকার একটি ধর্মীয় বিধান।

গ উদ্দীপকের সুমিত ব্রাহ্মণের অশৌচ ও অবিনাশ বৈশ্যের অশৌচ পালন করেছে।

'অশৌচ' শব্দের অর্থ শুচিতা বা পবিত্রতার অভাব। মাতা-পিতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে অশৌচ হয়। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর অশৌচকালে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়। এ সময় কঠোর সংযম পালন করে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। অশৌচ পালনে বর্ণপ্রথার প্রভাব দেখা যায়। উচ্চবর্ণের চেয়ে নিম্নবর্ণের লোকদের অশৌচ পালনের দিন সংখ্যা বেশি। ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন এবং শূদ্রের ত্রিশ দিন অশৌচ পালনের বিধান আছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, সুমিত চক্রবর্তী পিতার মৃত্যুর পর দশদিন যাবৎ এক বিশেষ ধরনের অন্ন ও ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করেছে। এ সময় সে কঠোর সংযম পালন করেছে। কিন্তু তারই বন্ধু অবিনাশ সাহা মাতার মৃত্যুর পর পনেরো দিন যাবৎ বিশেষ ধরনের অন্ন ও ফলফলাদি খেয়ে জীবন ধারণ করেছে। এখানে দশদিন ও পনেরো দিন অশৌচ পালনের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের অশৌচ পালনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ব্রাহ্মণদের অশৌচ পালন করতে হয় দশদিন। আর বৈশ্যদের অশৌচ পালন করতে হয় পনেরো দিন। তাই বলা যায়, সুমিত ব্রাহ্মণের এবং অবিনাশ বৈশ্যের অশৌচ পালন করেছে।

ঘ অশৌচ পালনের সময় সম্পর্কে উদ্দীপকের শিক্ষক অমল বাবুর উক্তিটির যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

অশৌচ পালনের দিবস সংখ্যায় তারতম্য ও অনুষ্ঠানের ভিন্নতা যৌক্তিক নয়। আর সেজন্য বর্তমানে প্রায় সব বর্ণের মানুষ দশদিন অশৌচ পালন করে একাদশ কিংবা ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করছেন। কিন্তু এটা স্বেচ্ছাকৃত। সকল বর্ণের জন্য অভিন্ন বিধান যৌক্তিক এবং হিন্দু সমাজের সামগ্রিক ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য অভিন্ন বিধান প্রয়োজন। বর্ণের পার্থক্যের কারণে কাউকে কম সময় আবার কাউকে বেশি সময় সংযম পালন করতে হবে এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

হিন্দু সমাজের আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না রেখে একই প্রকার বিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেননা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে জন্মভেদে নয়, বরং কর্মভেদেই বর্ণবিভাজন হয়। অর্থাৎ বর্ণভেদ জন্মগত বা বংশানুক্রমিক নয়, পেশাগত। বর্তমান সমাজের যে বর্ণপ্রথা রয়েছে তা এক ধরনের গোঁড়ামি। তবে এখন প্রায় সব বর্ণের বা গোত্রের মানুষ দশদিন অশৌচ পালন করেন। উদ্দীপকের সুমিতের মতো অবিনাশও দশদিন অশৌচ পালন করতে পারত।

উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায়, শিক্ষক অমল বাবুর উক্তিটি যথেষ্ট যৌক্তিক। কেননা, বর্তমানে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে পার্থক্য অনেক কমে এসেছে। এখন প্রায় সকল বর্ণের লোক একই নিয়মে ধর্মীয় আচার পালন করেন।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক শ্রাদ্ধ বাসরে মহাভারতের বিরাট পর্ব পাঠ করা হয়।

খ পিতা-মাতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুতে মন শোকে আচ্ছন্ন থাকে। ফলে আমাদের অশৌচ হয়। এই সময় কঠোর সংযম পালন করে হবিষ্যান্ন বা ফলফলাদি খেয়ে শ্রাদ্ধ করার উপযুক্ততা অর্জন করতে হয়। পিতা-মাতা বা জ্ঞাতিবর্গের মৃত্যুর পর চতুর্থ ও দশম দিনে পিণ্ড দান করতে হয়। এ পিণ্ডকে বলা হয় পূরকপিণ্ড। পূরকপিণ্ড দিতে হয় মোট দশটি।

গ শাস্ত্রমতে, শ্রাদ্ধের অধিকারী হলেন জ্যেষ্ঠপুত্র। প্রণব বিভিন্ন ধর্মীয় কার্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করবে। শ্রদ্ধার সাথে যা দান করা হয় তাই হলো শ্রাদ্ধ। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়, তাকে বলা হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। অশৌচকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরের দিন অনুষ্ঠিত হয় আদ্যশ্রাদ্ধ। এ সময় ছয়, আট, ষোলো প্রভৃতি দানের বিধান আছে। যার যেমন সামর্থ্য সে তেমনি দান করে থাকে। আদ্যশ্রাদ্ধে গীতা ও মহাভারতের বিরাট পর্ব পাঠেরও বিধান আছে।

প্রণব তার বাবার মৃত্যুর পর অশৌচ পালন শেষে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ অনুষ্ঠানের প্রথমে প্রদীপ জ্বালিয়ে বাস্তুপুরুষ যজ্ঞেশ্বর ও ভূস্বামীর পূজা করতে হয়। অতঃপর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল, মালা, বিছানা প্রভৃতি উৎসর্গ করতে হয়। পরে পিণ্ডদান করে আদ্য একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ শেষ হয়। এসব কাজের মাধ্যমে প্রণব তার বাবার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে।

ঘ শ্রাদ্ধের ব্যাপারে শ্রদ্ধাই মুখ্য। যেখানে শ্রদ্ধার সংযোগ নেই সেখানে আড়ম্বর থাকলেও শ্রাদ্ধ হয় না।

হিন্দুধর্মের অন্যতম সংস্কার হলো আদ্যশ্রাদ্ধ। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ করণীয়, তা হলো আদ্যশ্রাদ্ধ। আবার একজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয় বলে একে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধও বলা হয়। শাস্ত্র অনুসারে মহর্ষি নিমি হলেন শ্রাদ্ধের প্রবর্তক। বস্তুত যার যেমন সামর্থ্য সে অনুসারে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোই হলো শ্রাদ্ধ। আদ্যশ্রাদ্ধের সময় শাস্ত্রে ছয়, আট, ষোলো বিভিন্ন দানের বিধান আছে।

উদ্দীপকের প্রণব অশৌচ পালন করে তার বাবার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। শ্রাদ্ধের মূলকথা হলো, শ্রদ্ধার সাথে দান। পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন নিয়ম-রীতি, রয়েছে আনুষ্ঠানিকতার বৈচিত্র্য। তবে সবকিছুর মূলে রয়েছে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। প্রণবসহ তার পরিবার মৃত বাবার উদ্দেশ্যে যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তার বাবার আত্মা যেন পরলোকে শান্তি পায় সেই কামনাও করে। এই কারণে তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ড যথার্থ শ্রাদ্ধ বলেই মনে করা হয়।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা-ই দান করা হোক না কেন, তা সম্পন্ন করতে হবে শ্রদ্ধার সাথে। কারণ শ্রাদ্ধের ব্যাপারে শ্রদ্ধাই মুখ্য।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পূজা ' শব্দের অর্থ প্রশংসা বা শ্রদ্ধা জানানো।

খ 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' কথাটির অর্থ এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ ও জ্ঞানীরা বহু নামে বর্ণনা করেছেন।

ঈশ্বর সীমাহীন গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতাকে বিশেষ আকার বা রূপে প্রকাশ করেন, তখন তাকে দেবতা বলে। দেবতারা আলাদা গুণ বা শক্তির অধিকারী হলেও ঈশ্বর নন। তারা এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার প্রকাশ। শুধু বিপ্রগণ তাদের বিভিন্ন নামে বর্ণনা করেছেন।

গ প্রিয়াদের বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা করা হয়।

লক্ষ্মী ধনসম্পদ, সৌভাগ্য, এবং সৌন্দর্যের দেবী। তিনি আমাদের বিভিন্ন সম্পদ দান করে থাকেন। তিনি নারায়ণপত্নী ও কল্যাণের দেবী। পারিবারিক ও ব্যবসায়িক সচ্ছলতার প্রত্যাশায় রমণীরা প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা পবিত্রতার সাথে লক্ষ্মীপূজা করে। উদ্দীপকের প্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় লক্ষ্মীপূজা করেছিল তা বর্ণনা করা হলো– লক্ষ্মীপূজায় একটি ফুল ও দুটি তুলসীপাতা দিয়ে নারায়ণকে পূজা করা হয়। পূজার আগে পূজাস্থান পরিষ্কার করে লক্ষ্মীঘটের পাশে লক্ষ্মীর পা আঁকা হয়। মনকে স্থির করে পবিত্র হয়ে পূজা করতে হয়। লক্ষ্মীঘটে সিঁদুর দিয়ে মঙ্গলচিহ্ন আঁকতে হয়, ঘটের ওপর একটি আম্রপল্লব ও তার ওপর একটি কলা বা হরীতকী ফল দিতে হয়। এরপর ধ্যানমন্ত্র, আবাহনমন্ত্র ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে ব্রতকথা পাঠ করতে হয়। আন্তরিকভাবে লক্ষ্মীপূজা শেষে লক্ষ্মীদেবীর পাঁচালী পাঠ করলে বিনা মন্ত্রেই পূজা সিদ্ধ হয়। উক্ত পূজাপদ্ধতি অনুসরণ করেই প্রিয়াদের পরিবারে লক্ষ্মীদেবীর পূজার আয়োজন করা হয়।

ঘ দেব-দেবীর একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, কেননা তারা একজন ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা ক্ষমতার অধিকারী।

দেবতা শব্দটি 'দিব্' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে দেবী বলা হয়। 'দিব্' ধাতুর অর্থ প্রকাশ পাওয়া। তাই যিনি প্রকাশিত হন, যিনি ভাস্বর, তিনিই দেবতা। আবার যিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অন্যকে প্রকাশ করেন তিনিও দেবতা। ঈশ্বর এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। তিনি নিরাকার আবার প্রয়োজনে সাকার রূপ ধারণ করেন। দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। অর্থাৎ ঈশ্বর যখন নিজের কোনো গুণ বা ক্ষমতার রূপকে বিশেষ আকারে প্রকাশ করেন তখন তাঁদের দেব-দেবী বলে। যেমন: ব্রহ্ম বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি।

দেব-দেবীরা পরিপূর্ণ ঈশ্বর না হলেও মহান ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত। কেননা তার ঈশ্বরের এক বা একাধিক গুণ বা শক্তি ধারণ করে আছেন। তবে সব নদীর জলরাশির ধারা যেমন এক সাগর-মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছায় তেমনি দেব-দেবীর আরাধনার মাধ্যমে আমরা মূলত সৃষ্টিকর্তা, দয়াময়, করুণাময় ঈশ্বরেরই উপাসনা করি। উদ্দীপকের প্রিয়াদের পরিবার ঈশ্বরের সম্পদরূপ দেবী লক্ষ্মীর উপাসনা করে। এভাবে দেবতাদের পূজা বা উপাসনা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন এবং ভক্তদের অভীষ্ট ফল দান করেন।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, 'দেব-দেবীর একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ'- কথাটি পুরোপুরি যৌক্তিক।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'ধ্যান' শব্দের অর্থ নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা।

খ সমাধি অর্থ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ।

অষ্টাঙ্গযোগের সর্বশেষ অঙ্গ হচ্ছে সমাধি। সমাধির মাধ্যমে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন ঘটে, সাধকের সাধনা শেষ হয়। অর্থাৎ ধ্যানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে সাধক সমাধি লাভ করেন। তখন মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, অহংশূন্য হয়ে সাধকের সাথে পরমাত্মার মিলন ঘটে।

গ অনিন্দ্যের অনুশীলন করা যোগাসনটি হলো হলাসন।

আমরা জানি, 'হল' অর্থ লাঙল। হলাসন অনুশীলনে দেহভঙ্গি অনেকটা লাঙলের মতো দেখায় বলে আসনটির এ নাম। নিয়মিত হলাসন অনুশীলন করলে পেটের পীড়া, মূত্রাশয়ের সমস্যা সমাধানসহ নানা ধরনের উপকারিতা পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের অনিন্দ্য যেহেতু পেটের পীড়া ও মূত্রাশয়ের সমস্যায় ভুগছে তাই সেও এ আসনটি অনুশীলন করতে পারে। হলাসন অনুশীলনের সময় পা দুটো সোজা করে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। এসময় উরু, হাঁটু ও পায়ের পাতা জোড়া অবস্থায় থাকবে। হাত দুটো সোজা করে শরীরের দু'পাশে রাখতে হবে। এরপর নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পা দুটো জোড়া ও সোজা অবস্থায় আস্তে আস্তে ওপরে তুলে মাথার পেছনে যতটা সম্ভব দূরে নিতে হবে যেন পায়ের আঙ্গুলগুলো মাটি স্পর্শ করতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এই অবস্থায় ৩০ সেকেন্ড থাকতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পা নামিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। এভাবেই অনিন্দ্য হলাসন অনুশীলন করবে।

ঘ নিয়মিত হলাসন অনুশীলনে অনিন্দ্যের শারীরিক সমস্যা দূর হবে এবং সে সুস্থ, সুন্দর জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

হলাসন অনুশীলনের ফলে আমাদের মেরুদণ্ড নমনীয় ও সুস্থ থাকে। এ ছাড়া ডায়াবেটিস, বাত ও সায়টিকার ব্যথা, পেটের পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে বা দূর হয়।

উদ্দীপকের বর্ণিত অনিন্দ্য নিয়মিত যদি হলাসন অনুশীলন করে তবে তার মেরুদণ্ড সুস্থ ও নমনীয় হবে এবং স্থিতিস্থাপকতা বজায় থাকবে। এর ফলে মেরুদণ্ড সংলগ্ন স্নায়ুকেন্দ্র ও মেরুদণ্ডের দুপাশের পেশি সতেজ ও সক্রিয় হবে। প্লীহা, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, টনসিল ইত্যাদি গ্রন্থি সবল ও সক্রিয় হবে। এছাড়াও হলাসন অনুশীলনে অনিন্দ্যের পেট, কোমর ও নিতম্বের মেদ কমে দেহ সুঠাম ও সুন্দর হবে। পিঠে ব্যথা থাকলে তাও দূর হবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষকের পরামর্শ মতো নিয়মিত হলাসন অনুশীলন করলে অনিন্দ্য শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবে। পাশাপাশি তার মন সতেজ থাকবে এবং সে কাজ-কর্মে বাড়তি উৎসাহ পাবে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মের বিশেষ লক্ষণ চারটি।

খ বেদ কোনো মানুষের সৃষ্টি নয় বলে বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এটি কোনো মানুষের বা ঋষিদের সৃষ্ট নয়। এটি ধ্যানের মাধ্যমে প্রাপ্ত। ঈশ্বর স্বয়ং বেদ সৃষ্টি করেছেন। এজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সমর বাবু বেদের অথর্ববেদ অংশটি অধ্যয়ন করেছেন। বেদ চার ভাগে বিভক্ত। যথা– ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। অথর্ববেদ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল। এখানে নানা প্রকার রোগব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের জন্য ব্যবহার করার মতো বিভিন্ন লতা, গুল্ম, বৃক্ষাদির বর্ণনা রয়েছে। আয়ুর্বেদ নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎস এই অথর্ববেদ সংহিতা। এছাড়া গৃহনির্মাণ সম্পর্কেও এই সংহিতায় বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, অথর্ববেদ থেকে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সমর বাবু বেদের যে অংশটি পড়েছেন তাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে। বেদের চারটি অংশের মধ্যে অথর্ববেদেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক নির্দেশনা দেওয়া আছে। তাই বলা যায়, সমর বাবু অথর্ববেদ অধ্যয়ন করেছেন।

ঘ 'বেদ এক অখণ্ড জ্ঞানরাশি'– এই উক্তিটি যথার্থ।

বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। এটি হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বিশ্বের প্রাচীন ইতিহাস জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ হলো বেদ। এটি একটি বিশাল জ্ঞানভান্ডার। বেদ পাঠ করলে স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠ করলে আমরা বিভিন্ন দেব-দেবী সম্পর্কে জানতে পারি। ঈশ্বরের শক্তি, রূপ ও গুণ সম্পর্কে জানতে পারি। সামবেদ অধ্যয়ন করলে সংগীতের রীতি এবং সুর দিয়ে বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করার উপায় জানা যায়। যজুর্বেদে আছে যজ্ঞের বিভিন্ন নিয়ম-রীতি সম্পর্কে ধারণা। বর্ষপঞ্জিকার উদ্ভাবন হয়েছে যজুর্বেদ থেকেই। অথর্ববেদে বলা হয়েছে বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা পদ্ধতির কথা।

বেদ বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থ থেকে মানবজাতি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সন্ধান লাভ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সবকিছুর মধ্যে বেদের প্রতিফলন রয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, বেদ এক অখণ্ড জ্ঞানরাশি। এটি ধর্মের মূল।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক বীরের ধর্ম হলো ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা।

খ মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

মানবতার কারণেই মানুষ অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা। মানবতা মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ এবং এটি ধর্মের অঙ্গ। মহত্ত্বের উৎসই হচ্ছে মানবতা। তাই মানবতা যেমন ধর্ম তেমনই মহত্ত্বও ধর্ম।

গ উদ্দীপকের চয়ন বাবুর মধ্যে তরণীসেনের নৈতিক আদর্শ ফুটে উঠেছে। তরণীসেন ছিলেন রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। তিনি সৎসাহসের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। রাম-লক্ষ্মণের সাথে রাক্ষস বাহিনীর যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনীর বড়ো বড়ো বীর যোদ্ধা প্রাণ ত্যাগ করে। সোনার লঙ্কা পরিণত হয় শ্মশানে। এ অবস্থায় মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে যান তরণীসেন। এ যুদ্ধে রামের বৈষ্ণব অস্ত্রে তরণীসেন মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত এভাবেই সৎসাহসের অধিকারী ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রতিবাদ করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, চয়ন বাবু ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। এজন্য তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। চয়ন বাবুর এ ঘটনার মাধ্যমে তরণীসেনের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। তরণীসেন মাত্র বারো বছরের বালক হয়েও সৎসাহস দেখিয়েছেন। দেশ এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাই বলা যায়, চয়ন বাবু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরণীসেনের মতো সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

ঘ সঞ্চিতাদেবীকে প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ বলা যায় না।

একজন মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় যখন তার মধ্যে মানবতা নামের বিশেষ গুণটি থাকে। মানবতা একটি নৈতিক গুণ। এটি ধর্মের অঙ্গ। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ এ দশটি গুণ যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্ণকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একদিন সঞ্চিতাদেবী একাদশী ব্রত পালন করছেন। এমন সময় সেখানে একজন ভিক্ষুক এসে খাবার চাইলে তার কাছে খাবার না থাকায় তিনি খুব রেগে যান এবং ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেন। সঞ্চিতাদেবী ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে একটি অমানবিক কাজ করেছেন। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল দান ইত্যাদি মানবতার দৃষ্টান্ত। এসব কাজের মাধ্যমে মানবতা নামক গুণের প্রকাশ পায়। সঞ্চিতাদেবীর কাজের মাধ্যমে বোঝা যায়, তার মধ্যে মানবতা গুণটি অনুপস্থিত।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সঞ্চিতাদেবী একজন প্রকৃত মানুষ নন। কারণ, তার মধ্যে মানবতার গুণ নেই। তাই আমরা আমাদের জীবনে মানবতার গুণগুলো অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হব। কারণ মানবতাই ধর্ম, অমানবিকতাই পাপ।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক বেদের পরে কর্তব্য বা অকর্তব্য ধর্ম বা অধর্ম নির্ণয়ের জন্য রচিত গ্রন্থাবলিকে বলা হয় স্মৃতিশাস্ত্র।

খ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য ধর্ম পালন করা হয়। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবনে ধর্ম পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্ম ও ধর্মনীতি মানুষকে নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী করে তোলে। মানবিক মূল্যবোধের উন্নতি এবং পরিবার ও সমাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে ধর্ম পালন করা প্রয়োজন। তাই পরিবার ও সমাজ সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে ধর্ম পালন করা প্রয়োজন। তাই পরিবার এবং সমাজকে সুন্দর, মানবিক ও কল্যাণকর করার জন্য আমাদের ধর্ম পালন করতে হবে।

গ উদ্দীপকের নমিতা গুরুজনদের প্রতি যে প্রণাম করে তা হলো অভিবাদন।

প্রণাম বলতে বোঝায় প্রকৃষ্টরূপে নমন বা নমস্কার। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শব্দকোষ' গ্রন্থ অনুযায়ী প্রণাম চার প্রকার। যথা– ১. অভিবাদন, ২. পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, ৩. অষ্টাঙ্গ প্রণাম ও ৪. নমস্কার। বাক্যের দ্বারা 'প্রণাম করি' বলে আনত হওয়াকে বলা হয় অভিবাদন। অনেক-সময় বাক্য উচ্চারণ না করে কেবল আনত হয়েও অভিবাদন জানানো হয়। উদ্দীপকেও অভিবাদনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, দশম শ্রেণির ছাত্রী নমিতা আচার-ব্যবহারে অমায়িক। গুরুজনদের সাথে দেখা হলে সে মাথানত করে অভিবাদন জানায়। এ জন্য গুরুজনরা তার প্রতি সবময়ই সদয় থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, নমিতা গুরুজনদের প্রতি যেভাবে সম্মান প্রদর্শন করে তা হলো অভিবাদন। কারণ অভিবাদন করতে হয় আনত হয়ে অর্থাৎ নত করে। তাই বলা যায়, নমিতা অভিবাদনের মাধ্যমে গুরুজনদের প্রণাম করে।

ঘ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নমিতার বাবার কাজটি অর্থাৎ ধূমপানের প্রভাব অত্যন্ত নেতিবাচক। ধূমপান করা এক ধরনের মাদকাসক্তি। কারণ ধূমপান, মদ, গাঁজা, আফিম, হেরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি মাদকের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো একবার গ্রহণ করা শুরু হলে তা নেশায় পরিণত হয়, যা আর সহজে ছাড়া যায় না। ধূমপায়ী সময়মতো ধূমপান করতে না পারলে অস্থির হয়ে ওঠে। ধূমপানের ফলে নানাবিধ রোগ হয়। যেমন- নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যান্সার, আলসার, ক্ষুধামান্দ্য, হৃদরোগ ইত্যাদি। তা ছাড়া ধূমপান শুধু ধূমপায়ীর ক্ষতি করে না, অন্যদেরও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ধূমপানের কারণে মানুষ সামাজিকভাবে অনেক সময় হেয়প্রতিপন্ন হয়। ধূমপায়ী ব্যক্তির মুখে সবসময় দুর্গন্ধ থাকে। এজন্য অন্যের সাথে কথা বলার সময় অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিকে লজ্জা পেতে হয়। এসব অস্বস্তির কারণে মানসিক ক্ষতি হয়। ধূমপানের দ্রব্যাদি ক্রয়ের অর্থ যোগাড় করতে ধূমপায়ী কখনো কখনো অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও দ্বিধা করে না। প্রায়ই এমন দেখা যায় যে, ধূমপান দিয়ে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি অন্যান্য নেশা জাতীয় দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। উপরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধূমপান তথা মাদকের প্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। মাদকাসক্ত হয়ে আজকাল অনেক যুবক বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পরিবার ও সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট করছে।

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

খ সত্যই সকল ধর্মের ভিত্তি। কারণ সৎ হওয়া আর সৎকর্ম করা ধর্মের অঙ্গ। একমাত্র সত্যের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরলাভের পথ প্রসারিত হয়। যে ব্যক্তি সত্যবাদী এবং সাহসী, সে সবকিছুই করতে পারে।

গ বাঁধন বাধুর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নারীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ গুণটি লক্ষ করা যায়। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

বিবেকানন্দ নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আর এজন্য নারীশিক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতেন। বৈদিক যুগের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষী নারীর উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, সেই যুগে নারীরা যদি এত শিক্ষালাভ করতে পারে, তাহলে এ যুগের নারীরাও পারবে। তাঁর মতে, যে জাতি নারীদের সম্মান দেয় না, সে জাতি কখনো বড় হতে পারে না। নারীদের অবস্থার উন্নতি না করে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করা সম্ভব নয়। কোনো পাখি একটি ডানা দিয়ে উড়তে পারে না। এমনকি অধ্যাত্ম সাধনায় নারীরা যাতে সুযোগ পায় এবং এগিয়ে আসে তার জন্য তিনি সারদাদেবীর পরিচালনায় নারীদের জন্য একটি মঠ প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা করেছিলেন।

উদ্দীপকে বাঁধন বাবু তার এলাকায় একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কারণে তাদের এলাকার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের মতো বাঁধন বাবু নারীর শিক্ষার প্রতি অনুরাগের কারণে নারীদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছেন, যার মাধ্যমে তাদের এলাকার সার্বিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাই বলা যায়, বাঁধন বাবুর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নারী শিক্ষার প্রতি অনুরাগ গুণটি লক্ষ করা যায়।

ঘ রমেশ বাবুর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অসাম্প্রদায়িক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।"– মন্তব্যটির যথার্থতা নিচে মূল্যায়ন করা হলো–

বিবেকানন্দের কাছে কোনো জাতিভেদে ছিল না। তিনি বলতেন, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদের ভাই। এদের সেবাই পরম ধর্ম। তাঁর এই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ব্রাহ্মণ যুবকরা পর্যন্ত কলেরাপীড়িত চণ্ডালদের পাশে বসে তাদের সেবা করেছেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর ১০ বছর পর সুভাষচন্দ্র বসু তার রচনাবলি পড়ে অনুভব করতে পারেন যে, মানবসেবাই হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ। তাই নিঃস্বার্থ সেবাকেই তিনি তার জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে 'নেতাজি' ভূষণে ভূষিত হন।

উদ্দীপকে বাঁধন বাবুর ভাই রমেশ বাবু প্রতিবছর বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি সব ধর্ম ও বর্ণের লোককে নিমন্ত্রণ করেন। এ সময় তার বাড়িতে এক মিলনমেলার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের মতো সবাইকে তিনি আপন মনে করতেন। তাই বলা যায়, রমেশ বাবুর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অসাম্প্রদায়িক চেতনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

মডেল টেস্ট- ০২

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	M	৩	K	৪	N	৫	M	৬	L	৭	K	৮	K	৯	M	১০	N	১১	N	১২	L	১৩	N	১৪	M	১৫	N
	১৬	K	১৭	L	১৮	M	১৯	K	২০	N	২১	L	২২	M	২৩	N	২৪	L	২৫	L	২৬	L	২৭	K	২৮	M	২৯	N	৩০	M

সৃজনশীল

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন।

খ পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তিনি জীবাত্মার রূপ ধারণ করেন। এই পরমাত্মা থেকেই জীবের সৃষ্টি। আত্মা নিত্যবস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। একই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন। জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই।

গ উদ্দীপকে অমল বাবুর উপাসনা পদ্ধতিটি হচ্ছে সন্ন্যাস আশ্রম। নিচে বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো :

আশ্রম জীবনের চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় হলো পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে শাস্ত্রীয় নির্দেশে জীবনধারণ করা। 'সন্ন্যাস' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। এই আশ্রমে এসে সন্ন্যাসী একাকী জীবনধারণ করেন। এ সময় সন্ন্যাসীদের স্ত্রীও তাদের সঙ্গো থাকতে পারবেন না। সন্ন্যাসী কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরচিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। শুধুমাত্র দুপুরবেলার অন্ন আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুইবেলা দুধ ও ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে বা দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন।

উদ্দীপকের অমল বাবু তেমনি সাংসারিক কোনো কাজে মনোনিবেশ না করে বরং সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন।

পরিশেষে বলা যায়, সন্ন্যাস আশ্রমের মাধ্যমে কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ করা হয়।

ঘ উদ্দীপকে "কমল বাবু আত্মারূপে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন।" নিচে এ মতামতের সপক্ষে আমার যুক্তি দেওয়া হলো :

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান বলে অভিহিত করেন। জ্ঞানীদের কাছে ঈশ্বর ব্রহ্ম, যোগীদের কাছে পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবান নামে পরিচিত। পরমাত্মা জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে অবস্থান করেন তখন তিনি জীবাত্মার রূপ ধারণ করেন। এই পরমাত্মা থেকেই জীবের সৃষ্টি। আত্মা নিত্য বস্তু ও নিরাকার। আত্মার জন্ম নেই মৃত্যু নেই। এই পরমাত্মা বহু আত্মারূপে জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করেন। জীবদেহের বিনাশ আছে কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই। কারণ জীবাত্মা পরমাত্মার অংশবিশেষ। পরমাত্মার সকল গুণই জীবাত্মার মধ্যে বিদ্যমান। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মার সৃষ্টি ও বিনাশ কোনোটিই সম্ভব নয়। হিন্দুধর্মের একটি মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্যতম নৈতিক শিক্ষা হচ্ছে জীব সেবা। ঈশ্বর জীবরূপে আমাদের সম্মুখেই আছেন বলে তাকে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। যিনি জীবকে ভালোবাসেন তিনি সেই সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরেরই সেবা করেন। এমনকি বৃক্ষের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত। এজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন :

> 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
> জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

তেমনি উদ্দীপকে কমল সকল সাংসারিক কাজ এবং অসহায় হতদরিদ্র ব্যক্তিদের সাধ্যমতো সাহায্য করতে চেষ্টা করেন। কারণ তিনি তাদের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন।

পরিশেষে বলা যায়, সকল জীবের মধ্যে প্রাণরূপে ঈশ্বর বিরাজিত এবং তার সত্তা প্রমাণিত। এই সত্যকে উপলব্ধি করে জীব সেবা করা প্রয়োজন।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দুধর্মের মূলে স্বয়ং ভগবান।

খ ভক্তি মানব হৃদয়ের একটি সুকুমার বৃত্তি। ভক্তি বলতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভাবকে বোঝায়। নারদীয় ভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে– ভগবানে ঐকান্তিক প্রেম বা ভালোবাসাকে ভক্তি বলে। শাণ্ডিল্য সূত্রে ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে– ভগবানের পদে যে একান্ত রতি, তারই নাম ভক্তি।

গ সুজন বাবুর ঈশ্বর লাভের উপায় পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করা হলো–

বেদ ও উপনিষদে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি একাধিক নন। এই যে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস একেই বলে একেশ্বরবাদ। প্রচলিত বহু দেব-দেবীর উপাসনা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক। তবে দেব-দেবীগণ ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা গুণের অধিকারী।

ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, উষা প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রশস্তি রয়েছে। এরা ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয় বহন করলেও এদের সম্মিলিত শক্তির কেন্দ্রটি হচ্ছেন ঈশ্বর। ঋগ্‌বেদে এ সম্পর্কে ঋষিদের উপলব্ধি হচ্ছে : 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'।

অর্থাৎ সদ্‌বস্তু এক, বিপ্রগণ তাকে বহুপ্রকার বলে বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে কঠোপনিষদে দেখা যায় 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (কঠ ২/১১/১১) ব্রহ্ম থেকে পৃথক কিছু নেই। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। বিশ্বে ঈশ্বরের সমান আর কেউ নেই। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও একেশ্বরের কথা বলা হয়েছে। 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্'- (গীতা-৯/১৮)। এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে– তাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি, তাঁর দ্বারা স্থিতি এবং তাঁতেই হচ্ছে লয়। তিনি জগতের নিধান– আধার ও আশ্রয়।

উদ্দীপকে সুজন কোনো দেব-দেবীর উপাসনা না করে এক ঈশ্বর সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন রাখেন। অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় বা একেশ্বরবাদের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভ করবেন।

ঘ উদ্দীপকে ধীমান বাবুর জীবনযাপনের সাথে সন্ন্যাস আশ্রমের মিল রয়েছে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো–

আশ্রম জীবনে চতুর্থ পর্যায়ে আসে সন্ন্যাসের কথা। এ সময় পঁচাত্তর থেকে একশ বছরের মধ্যে জীবনধারণের শাস্ত্রীয় নির্দেশ আছে। সন্ন্যাসী জাগতিক সকল কর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ঈশ্বরচিন্তাতেই মগ্ন থাকবেন। শুধুমাত্র দুপুরবেলায় আহারের সামগ্রী লোকালয় থেকে সংগ্রহ করবেন। বাকি দুবেলা দুধ, ফল ইত্যাদি সংগ্রহ করে স্বল্প পরিমাণে আহার করবেন। আশ্রয়হীন অবস্থায় মন্দিরে দেবালয়ে ক্ষণকালের জন্য আশ্রয় নিতে পারেন। পোশাক-পরিচ্ছদ থাকবে নিতান্তই সাধারণ। অতীত জীবনের স্মৃতি সব পরিহার করে একমনে একধ্যানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকবেন। শাস্ত্রবচনে জানা যায় 'দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।' অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষ নারায়ণ বা দেবতা হয়ে যায়। তবে সন্ন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ'।

উদ্দীপকে ধীমান বাবুও সংসারের সকল কামনা-বাসনা-আসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনায় বেরিয়ে পড়েন এবং দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে ভগবানের নাম বিতরণ করেন। অর্থাৎ তিনি কর্মফলাসক্তি ও ভোগাসক্তি ত্যাগ করে ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

তাই বলা যায়, ধীমান বাবুর জীবনযাপনের সাথে সন্ন্যাস আশ্রমের মিল রয়েছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ঊনবিংশ শতকে হিন্দুধর্মের চিন্তাচেতনার বিকাশ শুরু হয়।

খ অযাচক বৃত্তি বলতে উপাসনার একটি রীতিকে বোঝায়।

অযাচক বৃত্তি পালনের সময় অন্যের কাছে কিছু চাওয়া যায় না, বরং কেউ ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দান করবে তা দিয়েই দিনযাপন করতে হয়। রাজা রন্তিবর্মা অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এ সময় তিনি কারো কাছে কোনো সাহায্য চাননি।

গ উদ্দীপকে স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া আছে। ১৮৯৩ সালে বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরে স্বামী স্বরূপানন্দ আবির্ভূত হন। তিনি 'অযাচক আশ্রম' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। নামের মাঝেই এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এই সংগঠনটি নিজে উপযাচক হয়ে কারো কাছে কোনো সাহায্য প্রার্থনা করে না বা চায় না। এই সংগঠনে ব্যক্তি বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যদি নিজে থেকে কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করে তাহলে তারা তা সাদরে গ্রহণ করে। এছাড়া এ সংগঠনের সদস্যগণ নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন ও চলতেন। উদ্দীপকের রনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পর চাকরি না পেয়ে হতাশ হলে তার বন্ধু বনি তাকে একটি আশ্রমে নিয়ে যায়। এই আশ্রমের বাসিন্দারা কারো কাছ থেকে কোনো প্রকার সাহায্য নেয় না। এরা নিজেদের সকল ব্যবস্থা নিজেরাই করে। রনি যে আশ্রমে যায় তা 'অযাচক আশ্রম' কারণ এই আশ্রমের সকলে নিজেরাই নিজেদের খরচ যোগায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত স্বামী স্বরূপানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'অযাচক আশ্রম' সমাজ বাস্তবতায় খুবই গুরুত্ববহ। অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দ। অযাচক অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ না চাওয়া। এটাই এই সংগঠনের আদর্শ। এর মাধ্যমে চরিত্র গঠন হয়। কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই নিজের দায়িত্বভার নেয়ার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে উঠার ওপর জোর দেয়া হয়। যা উদ্দীপকের রনির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এইভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সমাজের জন্য কাজ করাই এ সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে চরিত্র গঠন, সমাজসংস্কার, ব্রহ্মচর্য, স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা ও জগতের কল্যাণকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই হচ্ছে-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর সারকথা হলো নিজে ভালো মানুষ হওয়া এবং অপরকে ভালো মানুষ হতে সহায়তা করা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটা সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠে এর মাধ্যমে। মানুষের প্রধান লক্ষ্য মোক্ষলাভ। মোক্ষলাভের জন্য নিজের পাশাপাশি জগতের কল্যাণ সাধন করা দরকার। সবার ভালো ও সহায়তায় একটা ভালো সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। অযাচক আশ্রম তথা স্বরূপানন্দের মতাদর্শ এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। তাঁর এই সংগঠনে যোগদানের মধ্য দিয়ে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বাবলম্বী হওয়ার মাধ্যমে চরিত্র গঠন করতে হবে। এর মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য, সমাজসংস্কার ও জগতের কল্যাণ সম্ভব।

অযাচক আশ্রমের আদর্শ গ্রহণের মাধ্যমে নিজের পাশাপাশি দেশ ও সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কারে ভূমিকা রাখতে পারে, তাই সঠিক উন্নয়নের জন্য তাঁর মতাদর্শ অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা মাসের শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি।

খ হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সারা বছর নানা উৎসব-অনুষ্ঠান করে থাকে, এ জন্য বলা হয় 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'।

হিন্দুধর্মের উৎসবগুলোর মধ্যে কিছু আছে ধর্মানুষ্ঠান। আর কিছু আছে লোকাচার। মূলত এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবনকে কল্যাণময়, সুখময় ও আনন্দময় করার চেষ্টা থাকে সতত। যেসব আচার-আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে, তা ধর্মাচার বা লোকাচার নামে স্বীকৃত। অপরদিকে ধর্মশাস্ত্রে পূজা এবং অবশ্য পালনীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে। এগুলোকে বলা হয় ধর্মানুষ্ঠান। সংক্রান্তি, গৃহপ্রবেশ, জামাইষষ্ঠী, রাখীবন্ধন, দীপাবলি, বর্ষবরণ, দোলযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি ধর্মাচার ও ধর্মানুষ্ঠান। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা সারা বছর এসব উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করে বলে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সুমিতাদের বাড়িতে প্রতিবছর যে ধর্মাচারের আয়োজন করা হয় তা হলো ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা।

কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা পালন করা হয়। এ দিনটি বড়ই পবিত্র। পুরাণে উল্লেখ আছে, কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনাদেবী তাঁর ভাই যমের মঙ্গল কামনায় পূজা করেন। তাঁরই পুণ্যপ্রভাবে যমবেদ অমরত্ব লাভ করেন। এ কল্যাণব্রত স্মরণে রেখে বর্তমানকালের বোনেরাও দিনটি পালন করে। ভাইকে যাতে কোনো প্রকার বিপদ-আপদ স্পর্শ করতে না পারে এ জন্য বোনেরা এ দিন উপবাস থেকে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয়। ভাইকে ফল, মিষ্টি, পায়েস, লুচি প্রভৃতি উপাদেয় খাবার পরিবেশন করা হয়। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, সুমিতাদের বাড়িতে প্রতিবছর হেমন্ত ঋতুতে একটি ধর্মাচারের আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনটি মূলত তার ভাই হৃদয়কে কেন্দ্র করে। এ উপলক্ষ্যে হৃদয়কে বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ানো হয়। এখানে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হেমন্ত ঋতু তথা কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা

করে ভাইফোঁটা ধর্মাচারটি পালন করা হয়। এ দিন বোনেরা ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করে। বোনেরা ভাইদেরকে ফলমূল, মিষ্টান্নসহ নানা ধরনের ভালো ভালো খাবার পরিবেশন করে। তাই বলা যায়, সুমিতাদের বাড়িতে প্রতিবছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা ধর্মাচারটি পালন করা হয়।

ঘ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে শরনদের গ্রামে অনুষ্ঠিত ধর্মানুষ্ঠানটি অর্থাৎ দোলযাত্রা অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন রাধা-কৃষ্ণকে দোলায় রেখে আবির, কুমকুমে রাঙিয়ে পূজা করা হয়। তাঁদের পূজা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে রং বা আবির মাখিয়ে আনন্দ করে। এ পূজার আগের দিন অর্থাৎ ফাল্গুনী শুক্লা চতুর্দশীর দিন 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়া' পুড়িয়ে অমঙ্গলকে দূর করার বা ধ্বংস করার প্রতীকী অনুষ্ঠান করা হয়। অনেক জায়গায় এ সময় সমস্বরে বলা হয়- 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া, কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে বলো সবাই, বলো হরিবোল'। ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোল পূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবীর নিয়ে রাধিকা ও অন্য গোপীদের সাথে রং খেলায় মেতেছিলেন। সে ঘটনা থেকেই এ দোল খেলার প্রবর্তন।

দোলপূর্ণিমার দিন দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে গান, মেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এ উৎসবের দিন সকাল থেকেই শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই বিভিন্ন প্রকার রং নিয়ে খেলায় মত্ত হয়। জাতিগত ভেদাভেদ ভুলে সবাই এক হয়ে একে অপরকে রাঙিয়ে দেয়। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ এ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। ফলে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এ পাঠটি পালনের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভেদাভেদ এবং বৈষম্য হ্রাস পায়। সবাই সবাইকে আপন করে নেয়। বর্তমানে এ উৎসবটি সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, দোলযাত্রা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাঠ শেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা গুরুগৃহ থেকে নিজগৃহে ফিরে আসার সময় যে অনুষ্ঠান করা হয় তার নাম সমাবর্তন।

খ সিঁদুর দিয়ে বিবাহচিহ্ন পরানো একজন হিন্দু নারীর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সম্প্রদান পর্ব ও যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে বর কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেয়। এরপর থেকেই কন্যা, অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর জীবিতাবস্থায় সিঁথিতে সিঁদুর পরতে পারবে। আমাদের দেশে অনেক স্থানে বাসি বিয়ের দিন, অর্থাৎ বিয়ের পরদিন সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়।

গ উদ্দীপকে শিলার জীবনের নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান বলতে বিবাহের কথা বলা হয়েছে। নিচে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হলো–

হিন্দুসমাজে বিবাহ হলো ধর্মীয় জীবনের চর্চা। শাস্ত্র অনুসারে সমগ্র জীবনে যে দশটি সংস্কার বা মাঙ্গালিক অনুষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে বিবাহ শ্রেষ্ঠ। বিবাহ বলতে বোঝায় বিশেষরূপে ভারবহন করা। বিবাহের ফলে পুরুষকে স্ত্রীর ভরণ পোষণ এবং মানসম্ভ্রম রক্ষায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপাত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। তবে এ আট প্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপাত্য উল্লেখযোগ্য। সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পর শপথ করে মালা বিনিময়ের মাধ্যমে যে বিবাহ করে তা গান্ধর্ব বিবাহ নামে পরিচিত। তবে এটি সমাজে এতটা প্রচলিত নয়। সমাজে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত বিবাহ হচ্ছে ব্রাহ্মবিবাহ। কন্যাকে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করে এবং অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে বিদ্বান ও সদাচারী বরকে আমন্ত্রণ করে কন্যাদান করাই হলো ব্রাহ্মবিবাহ।

তেমনি উদ্দীপকে প্রণয় বাবু তার কন্যা শিলাকে নতুন কাপড় ও স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করে একটি নির্দিষ্ট দিনে আত্মীয়দের উপস্থিতিতে বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকে শিলার মতো বিবাহের মাধ্যমে মানুষের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

ঘ উদ্দীপকে রথিনের ঠাকুর দাদার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। নিচে পারিবারিক জীবনে রথিনের ঠাকুর দাদার উদ্দেশ্যে পালিত আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো–

'শ্রদ্ধা' শব্দের সঙ্গে 'অণ্' প্রত্যয়যোগে 'শ্রাদ্ধ' শব্দ গঠিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে যা দান করা হয় তা-ই শ্রাদ্ধ। কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রথমে যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় আসন, ছাতা, পাদুকা, বস্ত্র, অন্ন, জল, তাম্বুল ইত্যাদি মৃতব্যক্তির নামে মন্ত্রোচ্চারণসহ উৎসর্গ করা হয়। আদ্যশ্রাদ্ধের যে শুধু ধর্মীয় দিক থেকে গুরুত্ব আছে তা নয়, পারিবারিক ও সামাজিক দিক থেকেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট রয়েছে। কেউ মারা গেলে পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন যেমন দেখতে আসেন তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে তার পরিবার, জ্ঞাতিবর্গের দুঃখের সাথে একাত্ম হন। এতে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। সকলেই সমব্যথী হয়। পাশাপাশি আত্মীয়স্বজনের একটি মিলনমেলাও হয়। একজনের প্রতি আরেকজনের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সামাজিকতার বীজ অঙ্কুরিত হয়।

উদ্দীপকের রথিনের ঠাকুর দাদা মারা গেলে রথিনদের বাড়িতেও তেমনি তার ঠাকুর দাদার আত্মার শান্তির জন্য আদ্যশ্রাদ্ধের মাধ্যমে দ্রব্যসামগ্রী উৎসর্গ করে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে।

পরিশেষে বলা যায়, আদ্যশ্রাদ্ধের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তির পাশাপাশি পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়।

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যার নামে সংকল্প করে পূজা করা হয় তাকে যজমান বলে।

খ দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তাদের কৃপা লাভ করার জন্য যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাকে পূজা বলে। পূজা শব্দের অর্থ হলো প্রশংসা বা শ্রদ্ধা, যা পুণ্যকর্মের মধ্য দিয়ে অর্চনা বা উপাসনার মাধ্যমে করা হয়। ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূপকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভক্তিসহকারে ফুল, দূর্বা, তুলসী পাতা, বিল্বপত্র, চন্দন, আতপচাল, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পূজা করা হয়। পূজার উদ্দেশ্য হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে বা দেব-দেবীদের কাছে মাথা নত করা এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা।

গ উদ্দীপকে-১ এ উল্লিখিত দেবী অর্থাৎ দুর্গা হলেন পৌরাণিক পুরাণের অন্যতম দেবী। যে সকল দেবদেবীর বর্ণনা পুরাণে করা হয়েছে তাদেরকে পৌরাণিক দেবদেবী বলা হয়। যেমন–ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, স্বরসতী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবী। দেবী দুর্গা ঈশ্বরের শক্তির প্রতীক। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া অর্থাৎ মহাজাগতিক শক্তি। দুর্গম নামক অসুরকে বধ করেছেন বলে তাঁকে দুর্গা বলা হয়। এ মহাবিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট বিনাশ করেন বলে তাকে দুর্গতিনাশিনী দেবীও বলা হয়। তিনি জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, গন্ধেশ্বরী, বনদুর্গা, চণ্ডী, নারায়ণী প্রভৃতি নামে পূজিত হন। দেবী দুর্গার দশটি হাত এবং তিনটি চোখ রয়েছে। এ জন্য তাকে ত্রিনয়না বলা হয়। তাঁর বাম চোখ চন্দ্র, ডান চোখ সূর্য এবং কেন্দ্রীয় বা কপালের উপরে অবস্থিত চোখ জ্ঞান বা অগ্নিকে নির্দেশ করে। তাঁর দশ হাতে দশটি অস্ত্র রয়েছে এবং সিংহ তাঁর বাহন। উদ্দীপকে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে তার সাথে দেবী দুর্গার সাদৃশ্য রয়েছে। দুর্গা দেবী যেহেতু পৌরাণিক দেবদেবীর অন্তর্গত, তাই বলা যায়, উদ্দীপকে-১ এর দেবী পৌরাণিক দেবদেবীর শ্রেণিভুক্ত।

ঘ উদ্দীপক ২-এ উল্লিখিত শক্তিটি হলো দেবী শীতলা। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বিবেকদের বাড়িতে বর্ষাকালে যে শক্তির পূজা করা হয় তাতে উপকরণ হিসেবে ঠান্ডাজাতীয় ফল ও মিষ্টির ব্যবহার করা হয়। এছাড়া এই শক্তি অনেক সময় একপ্রকার রোগ-প্রতিরোধকারী ভেষজ উদ্ভিদের পাতাও বহন করেন। এখানে শীতলা পূজার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শীতলা দেবী রোগ, তাপ, শোক দূর করেন এবং তিনি নিমের পাতা বহন করে থাকেন। নিম রোগ প্রতিরোধকারী উদ্ভিদ। সাধারণত শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে দেবী শীতলার পূজা করা হয়। শীতলা পূজার সময় ঠান্ডাজাতীয় ফলের প্রয়োজন হয়। শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্যে হলো রোগব্যাধি থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করা। শীতলা পূজা করলে বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যবিধি ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন হয়ে থাকি। কথিত আছে সম্মার্জনীর মাধ্যমে তিনি অমৃতময় শীতল জল ছিটিয়ে রোগ, তাপ, শোক দূর করে সকলকে শীতল করেন। শীতলা পূজার মাধ্যমে আমরা সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ হই। উপরে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নানা প্রকার রোগব্যাধি হতে মুক্ত থেকে সুস্থ ও সুখী সমৃদ্ধ জীবনযাপন করাই শীতলা পূজার মূল উদ্দেশ্য।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'হল' শব্দের অর্থ লাঙ্গল।

খ অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম ধাপ হচ্ছে যম।
যম অর্থ সংযম। পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে হিংসা, অশুভভাব থেকে নিয়ন্ত্রণ করাকে বলে যম। যম পাঁচ প্রকার। যথা– অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

গ শিবু বাবু বৃক্ষাসন অনুশীলন করেন। যে আসনে আসনকারীর দেহ বৃক্ষের মতো দেখায় তাকে বৃক্ষাসন বলে। নিচে বৃক্ষাসনের অনুশীলন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো :
বৃক্ষাসনে প্রথমেই দুই পা জোড়া করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ সময় পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে লেগে থাকবে। এবার ডান পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি বাম ঊরুমূলে রাখতে হবে, পায়ের পাতা ঊরুর সঙ্গে লেগে থাকবে। পাশাপাশি পায়ের আঙ্গুলগুলো থাকবে নিচের দিকে ফেরানো। এরপর কেবল বাঁ-পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। পাশাপাশি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু দুটি জোড়া করে বুকের কাছে আনতে হবে। তারপর তালু দুটি জোড়া রেখে হাত দুটি সোজা মাথার ওপর নিতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে এভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। পরে হাত নামিয়ে হাতের তালু দুটি ছেড়ে দিয়ে ডান পা সোজা করে আবার আগের মতো দুপায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এবার ঠিক একইভাবে ডান পায়ে দাঁড়িয়ে আসনটি করতে হবে। অর্থাৎ ডান পায়ে দাঁড়িয়ে বাম পা হাঁটুতে ভেঙে গোড়ালি ডান ঊরুমূলে রাখতে হবে। এবারও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে একইভাবে ১০ সেকেন্ড নিশ্চল হয়ে থাকতে হবে। আবার আগের মতো দুই পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। শেষে শবাসনে ১০ সেকেন্ড বিশ্রাম নিতে হবে। এভাবে তিনবার আসনটি অনুশীলন করতে হবে। ১০ সেকেন্ডে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আস্তে আস্তে সময় বাড়িয়ে ৩০ সেকেন্ড করতে হবে। এভাবে শিবু বাবু বৃক্ষাসন অনুশীলন করেন।

ঘ বৃক্ষাসন অনুশীলনে শিবু বাবুর শরীর ও মনে বিবিধ ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো–

১. বৃক্ষাসন অনুশীলনে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে।
২. পায়ের পেশির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।
৩. পায়ে জোর পাওয়া যায়, চলাফেরা করার ক্ষমতা বাড়ে।
৪. উরুর সংযোগস্থলের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
৫. কোমরের ও মেরুদণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
৬. হাতের ও পায়ের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়।
৭. হাঁটু, কনুই, বগল ইত্যাদি স্থানের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়।
৮. পায়ের ব্যথায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বৃক্ষাসন অনুশীলনে পায়ে বাতের ব্যথা থাকে না।
৯. যাদের হাত-পা কাঁপে এবং পা দুর্বল; এ আসন অনুশীলনে তাদের খুব উপকার হয়।
১০. রক্তে অত্যধিক কোলেস্টেরল থাকার জন্য বা অন্য কোনো কারণে ধমনিতে যে শক্ত হলদে চর্বিজাতীয় পদার্থ জমে তা রোধ হয়। ফলে থ্রম্বোসিস হতে পারে না।

পরিশেষে বলা যেতে পারে, বৃক্ষাসন অনুশীলনের ফলে শিবু বাবুর শরীরে ও মনে বিভিন্ন ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক হিন্দুধর্মের অপর নাম সনাতন ধর্ম।

খ বৈদিক সাহিত্য হচ্ছে হিন্দুধর্মের আদি ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ।
বৈদিক সাহিত্য বা বেদ নামক ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এর রচনাকাল খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ৯৫০ অব্দের মধ্যে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এ গ্রন্থে স্রষ্টা ও প্রকৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নামের চারটি অংশে বিভক্ত।

গ পলাশের পঠিত ধর্মগ্রন্থটি হলো বেদ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিষয়বস্তু ও রচনারীতির পার্থক্য অনুসারে বেদকে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে ভাগ করেন। ঋগ্বেদে রয়েছে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। স্তুতি অর্থ প্রশংসা আর প্রার্থনা অর্থ কোনো কিছু চাওয়া। বেদের এ অংশে ১০৪৭২টি মন্ত্র রয়েছে। মন্ত্রগুলো পদ্যে বা ছন্দে রচিত। বস্তুত ঋগ্বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র রয়েছে।

সামবেদে রয়েছে গান। যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই গান গাওয়া হয়। বেদের এ অংশে সর্বমোট ১৮১০টি মন্ত্র আছে। যজুর্বেদেও রয়েছে এমন কিছু মন্ত্র যেগুলো যজ্ঞ করার সময় পাঠ করা হয়। এখানে যজ্ঞের নিয়ম ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যজুর্বেদ কৃষ্ণ ও শুক্ল নামে দুই ভাগে বিভক্ত। দুটি মিলিয়ে মোট ৪০৯৯টি মন্ত্র রয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, বাস্তুশিল্পসহ মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞান নিয়ে সংকলিত হয়েছে অথর্ববেদ। এখানে প্রায় ৬০০০টি মন্ত্র রয়েছে।

ঘ 'পলাশের পঠিত ধর্মগ্রন্থ তার জীবনকে সুন্দর করবে'– উক্তিটি যথার্থ।

বেদ পাঠের মাধ্যমে স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায়। এ কারণে বেদের প্রতিটি শাখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঋগ্বেদসংহিতা পাঠের মাধ্যমে বিভিন্ন দেব-দেবী সম্পর্কে জানা যায়, অগ্নি, ইন্দ্র, উষা, রাত্রি, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা উপলব্ধি করা যায়। যজুর্বেদ হচ্ছে যজ্ঞের মন্ত্রের সংগ্রহ। যজুর্বেদ ও সামবেদ থেকে বিভিন্ন সময়ে যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ষপঞ্জি বা ঋতু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। অথর্ববেদ হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল। এখানে নানা প্রকার রোগব্যাধি এবং সেগুলোর প্রতিকারের ওষুধ হিসেবে বিভিন্ন লতা, গুল্ম ও বৃক্ষের বর্ণনা রয়েছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রের আদি উৎস এই অথর্ববেদসংহিতা। অথর্ববেদ থেকে বাস্তব জীবনের আরও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

উদ্দীপকের কলেজ ছাত্র পলাশ নিয়মিত বেদ অধ্যয়ন করে। এক পর্যায়ে তার উপলব্ধি হয়, মোক্ষলাভই মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে যেকোনো একটি উপায় অনুসরণের মাধ্যমে মোক্ষলাভ করা যায়। তবে কর্ম ও ভক্তির জন্যও প্রয়োজন জ্ঞান। সে জ্ঞানের মূল উৎস হলো বেদ। বেদ পাঠ করে দেব-দেবীদের কর্মযজ্ঞের কথা জেনে মোক্ষলাভের জ্ঞান পাওয়া যায়। সুতরাং পলাশ দেব-দেবীর কর্মযজ্ঞকে আদর্শ মনে করে বেদ পাঠের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দর করতে পারবে।

সুতরাং বলা যায়, 'পলাশের পঠিত ধর্মগ্রন্থ তার জীবনকে সুন্দর করবে'– উক্তিটি যথার্থ।

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক তরণীসেনের পিতার নাম বিভীষণ।

খ সত্য ও ন্যায়ের স্বার্থে ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নামই সৎসাহস।

যখন কেউ দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে, তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বল বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে নির্যাতনকারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহস প্রয়োজন। সৎসাহস থাকলে পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য মঙ্গলজনক কাজ করা যায়। এ কারণে বলা যায়, সংসার জীবনে সৎসাহসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ উত্তমের কৃতকর্মে সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। সৎসাহসের এরূপ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমিও অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারি।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় উত্তম কলেজ থেকে ফেরার পথে এক ছিনতাইকারীকে ব্যাগ নিয়ে দৌড়াতে দেখে। উত্তম ছিনতাইকারীকে ধরতে গেলে ছিনতাইকারীর আঘাতে আহত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মহিলার ব্যাগ উদ্ধার করে। উত্তমের এ কাজে সৎসাহসের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

আমি জীবনে সৎসাহসকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সাধন করতে পারি। দুর্বল বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করতে পারি। পাশাপাশি বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনদের সহযোগিতায় অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি। কারণ আমরা জানি, ভীরু-কাপুরুষরা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কোনো কল্যাণকর কাজ করতে পারে না। তাই আমি উত্তমের মতো সৎসাহসী হব এবং সমাজের, দেশের বা জাতির যে-কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করব না।

ঘ 'উত্তমের সৎসাহস যেন তরণীসেনের সৎসাহসেরই প্রতিরূপ'– উক্তিটি যথার্থ।

তরণীসেন এক সৎসাহসী বারো বছরের বালক। সে ছিল রাক্ষসরাজ রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র। রাক্ষস বাহিনীর সাথে রাম-লক্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে এবং এ যুদ্ধে রাক্ষস বাহিনী পরাজিত হচ্ছে– এ খবর পেয়ে বালক তরণীসেন সাহস করে রথ নিয়ে যুদ্ধ করতে আসে। রণক্ষেত্রে তার বাণের আঘাতে রামের পক্ষের অনেক বানর সৈন্য আহত হয়।

তরণীসেনের এ সৎসাহস দেখে রামচন্দ্র বিস্মিত হন। এ কারণে রণক্ষেত্রে তরণীসেনের মৃত্যুর পর তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন। রামচন্দ্রের আশীর্বাদে তরণীসেন রাক্ষস দেহ পরিত্যাগ করে দিব্যদেহ ধারণ করে বৈকুণ্ঠে চলে যায়।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, তরণীসেন বালক হওয়া সত্ত্বেও যে সৎসাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে ইতিহাসে তা অম্লান। সে দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সৎসাহস নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় চিত্তে যুদ্ধ করে। বীরের মতো লড়ে তরণীসেন প্রাণ বিসর্জন দেয়। উদ্দীপকের উত্তমের মধ্যেও সেরকম সৎসাহসের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। কারণ সে ছিনতাইকারীর আঘাতে আহত হওয়া সত্ত্বেও সৎসাহসের বলে বলীয়ান হয়ে পথচারী মহিলার ব্যাগটি উদ্ধার করেছিল।

তাই বলা যায়, উত্তমের সৎসাহস তরণীসেনের সৎসাহসেরই প্রতিরূপ।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধর্মের সাধারণ লক্ষণ দশটি।

খ 'জীবঃ ব্রহ্মৈব নাপরঃ' শ্লোকের অর্থ– জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রহ্ম তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই অবস্থান করেন। অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন। তাই সকল জীবই ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ। বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত, সর্বজ্ঞ, জ্যোতির্ময়, নিরাকার, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান। তিনি যখন জীবের দেহে আত্মারূপে অবস্থান তখন তাঁকে জীবাত্মা বলে।

গ মাদকদ্রব্য গ্রহণ বা মাদকাসক্তি অনৈতিক এবং অধর্মের পথ। কারণ মাদকাসক্তি একজন মানুষের স্বাভাবিক চেতনা ও বোধবুদ্ধির সাময়িক বিলোপ ঘটায়।

আমার কোনো মাদকাসক্ত বন্ধুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। এক্ষেত্রে প্রথমে আমার সংশ্লিষ্ট বন্ধুটিকে মাদকাসক্তির স্বাস্থ্যগত কুফল সম্পর্কে জানাবো। তাছাড়া মাদকাসক্তি যে চরম অনৈতিক ও অধর্মের পথ এ কথা তাকে বোঝাব। তাকে বলব, আমাদের ধর্মানুসারে মাদকাসক্তি ঘোরতর পাপগুলোর অন্যতম। তাই মাদকাসক্ত ব্যক্তি পাপী এবং যারা তার সঙ্গী হয় তারাও পাপী। তাদের স্থান হবে নরকে।

প্রয়োজনে মাদকাসক্ত বন্ধুকে একজন সাধুর কাছে নিয়ে গিয়ে ধর্মীয় উপদেশ শোনাব। মাদকদ্রব্য শরীর, মন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বহুবিধ অনিষ্টের কারণ, এ কথা তাকে বোঝাব। মাদকাসক্ত বন্ধুকে সহানুভূতির সাথে সঙ্গ দেব যাতে সে নিঃসঙ্গ অনুভব না করে। মনকে ভালো দিকে নেওয়ার জন্য তাকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাব। তার সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করব। এসব উদ্যোগ নিয়ে বন্ধুকে মাদকাসক্তি থেকে ফেরাতে পারব বলে আমি মনে করি।

ঘ পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মাদকাসক্তির নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

মাদকাসক্তির কারণে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য কেনার অর্থ জোগাড় করতে নৈতিকতা বোধ হারিয়ে অন্যায় কাজ করতেও দ্বিধা করে না। এর ফলে সমাজে অসামাজিক কাজ ও অপরাধ বৃদ্ধি পায়। সমাজজীবনে অশান্তি বিরাজ করে।

মাদক গ্রহণ বা মাদকাসক্তি অনৈতিক ও অধর্মের পথ। কারণ মাদকাসক্তি মানুষের মানবিক গুণাবলি ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য না পেলে অস্থির হয়ে ওঠে। তার আচরণ কখনও কখনও হয়ে ওঠে ধ্বংসাত্মক। ক্রমে অসুস্থ হয়ে গিয়ে সে পরিবার ও সমাজের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। হিন্দুধর্ম অনুসারে, মাদকাসক্তি মহাপাপ। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি মাদক গ্রহণ করে সে পরবর্তী জন্মে শূকর হয়ে জন্মগ্রহণ করবে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, মাদকাসক্তি পারিবারিক, সামাজিক ও নৈতিক জীবনে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং আমাদের সবার শপথ নেওয়া উচিত "ধূমপান, মাদক গ্রহণ অধর্মের পথ, চালাব না সে পাপপথে আমার জীবনরথ।"

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভগবান যখন পূর্ণরূপে অবতরণ করেন তখন তাকে পূর্ণাবতার বলে।

খ আন্তরিক হলে সকল ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়। 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ ধর্মীয় মত ও পথ ভিন্ন হলেও সকল মানুষের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক ঈশ্বর লাভ।

গ উদ্দীপকে রতন বাবুর পাঠ্যবইয়ের প্রভু নিত্যানন্দের চরিত্রের মিল রয়েছে। নিচে তা বর্ণনা করা হলো–

১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বীরভূম জেলায় জন্মগ্রহণ করা প্রভু নিত্যানন্দের প্রকৃত নাম ছিল কুবের। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন। কিন্তু পড়াশোনায় তার একদম মন ছিল না। তার চেয়ে ধর্মের প্রতি তার অনুরাগ ছিল বেশি। ধর্মকথা শুনতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তিনি খেলাধুলা করতেন বটে, তবে খেলার পরিবর্তে কোনো মন্দিরে গিয়ে বসে থাকতে তার বেশি ভালো লাগত। তার এই ধর্মানুরাগের মূলে ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কুবের শুধু শ্রীকৃষ্ণের কথাই ভাবতেন। কীভাবে তাকে পাওয়া যায় এই ছিল তার সারাক্ষণের ভাবনা। কোনো সাধু সন্ন্যাসীকে দেখলেই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করতেন কী করলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যাবে।

তেমনি উদ্দীপকে রতন বাবু ছোটবেলায় পড়ালেখায় মনোযোগী ছিলেন না। তিনি শুধু কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকতেন। কীভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় তা-ই তার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে, উদ্দীপকের রতন বাবুর সাথে প্রভু নিত্যানন্দের চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ বিরাজ বাবুর জীবনাদর্শ পাঠ্যবইয়ের শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর চরিত্রের সাথে সম্পর্কিত। নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো–

ধর্ম প্রচার ও মানবতার সেবায় যে সকল মনীষী স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অন্যতম। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে কিছুকাল পড়ার পর বিষয়কৃষ্ণ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের যোগাযোগ ঘটে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনে তার মনে পরিবর্তন আসে। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরক্ত হন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণের মেডিকেলের চূড়ান্ত পরীক্ষা যখন সামনে তখন ব্রাহ্মসমাজ থেকে ধর্ম প্রচারের ডাক এল। চিকিৎসক জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি হলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য বিজয়কৃষ্ণ। ঢাকা, বরিশাল, যশোর, খুলনা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। অনেককে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাও দেন।

ধর্মপ্রচারে বিজয়কৃষ্ণ শ্রীক্ষেত্র পুরী গেলে স্থানীয় কিছু ধর্মব্যবসায়ী ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে বিষমিশ্রিত লাড্ডু খেতে দিয়ে হত্যা করে। তেমনি বিরাজ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেও নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে দেশ ও বিদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান এবং তাদেরকে ধর্মপথে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু অসৎ ধর্মব্যবসায়ীরা তার প্রতি বিদ্বেষী হয়ে তাকে সুকৌশলে হত্যা করে।